KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩৭/২, দিলখুস স্ট্রীট, পার্ক সার্কাস কলকাতা-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : অতনু মজুমদার, [illegible]
Title : অন্য রকম	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1/1	Year of Publication : Aug 1984
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অতনু মজুমদার [illegible]	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

COMPLEMENTARY COPY

With Best Compliment of :

The Agarpara Company Ltd.

Manufacturers of :

Hessian, Sacking, Carpet Backing, Twine
Cotton Bagging & Jute & Cottonwebbing.

REGISTERED OFFICE

TOBACCO HOUSE
1 & 2, Old Court House Corner
Calcutta-700 001

Phone : 22-6823 (2 Lines),
Telex : 21-3531 Agp in.

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

সম্প্রতি; গল্প ও কবিতার ক্ষেত্রে বিষয় বস্তুর থেকেও আঙ্গিক-বিন্যাস সম্পর্কে লেখকরা উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। ইতিমধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখক তাঁদের উপন্যাসেও, অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক, এ ধরনের পরিবর্তন এনেছেন। খুব সামান্য, মামুলি-তুচ্ছ বিষয়গুলোকেও এ'রা গল্পের আকার দিতে সক্ষম হয়েছেন। স্পষ্টবাদিতা, নিজেরই কথা সাবলীলভঙ্গিতে বলা ও কল্পনা বহির্ভূত বাস্তবের নিত্য-নৈমিত্তিক 'সূক্ষ্ম' অনুভূতিগুলোকে পাঠকের স্নায়ুতে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস, বিগত কয়েকটি দশকে বাংলা সাহিত্যের কাঠামোকে খুব দ্রুত বদলে দিয়েছে। তবে এই নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার-স্যাপারগুলোর বিবরণ নিশ্চয় রিপোর্টিং নয়, অন্য কিছু।

মোটামুটি ষাটের দশকের গোড়া থেকেই, গল্প ও কবিতার কাঠামোকে নিয়ে এ ধরণের অনুসন্ধানের শুরু। পরের দুই দশকে ক্রমে এই প্রয়াস বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য লেখক কবিদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। অনুসন্ধানের প্রথম দিকে স্বভাবতই কাঠামোর অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পে, পাঠক চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে, প্রচণ্ড বিরক্তিতে, কিছু সংখ্যক পাঠক এ জাতীয় লেখাগুলোর সংস্পর্শ ত্যাগ করেন। বিভিন্ন সুপরিচিত সাহিত্য-গোষ্ঠীর মধ্যেও এ নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য পাঠক'কে ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে হয়। কেন না সত্তরের ও আশির দশকে সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলোতেও এ ধরণের লেখা উঁকি দিতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এই বিরক্তি ও দুর্বোধ্যতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখাগুলোর প্রতি পাঠকের টান (ভালোবাসা ?) বাড়তে থাকে। ষাটের দশকে, দুটি প্রধান সাহিত্য পত্রকে কেন্দ্র করে এই অনুসন্ধানের সূর্যোদয়।

যাই হোক, আমাদের সাহিত্য পত্র 'অন্যরকম' নতুন করে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কোন কিছু ঘোষণা করবে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের আঙ্গিক অনুসন্ধান এখনো শেষ হয় নি। শেষ হয়তো কখনই হবে না। 'অন্যরকম' এই ধারাটির ধারক ও বাহক হবে। সম্পূর্ণ নতুন স্বাদের গল্প, কবিতা সাজানো হবে এর প্রতিটি সংকলনে। লেখাগুলো অন্যরকম-এর হলেও তথাকথিত ইন্‌টেলেকচুয়াল ইজিম'কে সে নিশ্চয় এড়িয়ে চলবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা মুখরোচকের স্বাদে নড়ে চড়ে উঠবেন। এবং মন দিয়ে লেখাগুলো পড়ে, কলম খুলে সমালোচনা করবেন। আপনাদের শুভেচ্ছার ধারাটি যেন আমাদের চলায় পথে অক্ষুন্ন থাকে।

COMPLEMENTORY COPY

ছোটগল্প

লোডশেডিং-এ নক্সা

শান্তা চক্রবর্তী

লোডশেডিং-এ কলকাতার মানুষ যখন সবাই বিপর্যস্ত ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটে গেল। খাবার টেবিলে যখন তুফান, এমনি সময়ে এক সঙ্গে টপাটপ সব আলো নিবে গেল। আর ঘুরন্ত পাখাম ডানাগুলো সময় নিয়ে ঝিমিয়ে পড়ল।

তখন সবে সন্ধ্যে। ঘরে বাইরে আলো জেলে সান্ত্বনা মাঝের ঘরে এসে দাঁড়াল। মনিবাবু তখন এক পা এক পা করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। ঘরের সামনেই এক চিলতে চাতাল। সেখান থেকেই সিঁড়িপথটা নেবে গেছে নিচে। মনিবাবু সান্ত্বনাকে দেখে হাসলেন। বসার ঘরে ঢুকে জুতো মোজা ছাড়লেন। সান্ত্বনা পাখাটা বাড়িয়ে দিয়ে ডাকলে, 'বিন্দাবন! চায়ের জল চাপা।'

মনিবাবু এই দুরন্ত গরমে ঘামছিলেন। গলার টাইটা খুলে বললেন, 'কাল সকাল সাতটায় বেরোতে হবে।'

সান্ত্বনা ভুরু দুটো কুঁচকে জিগেস করলে, 'অত সকালে? কোথায়?

'আর বলো কেন? এম ডি র তলব।'

মুখ হাত ধুয়ে মনিবাবু মাঝের ঘরে এলেন। ইতি মধ্যে চা জল খাবার তৈরী। যেতে যেতেই মনিবাবু বললেন, 'নক্সাটা শেষ করলুম। আপিসে সময়ই পাই না। নইলে কবে শেষ হ'তো।

সান্ত্বনা একটু অবাক হয়ে জিগেস করলে, 'কিসের নকসা?'

'বাড়ির' মনিবাবু উত্তর দিলেন।'

বুর্ণাক রবার বাঁধা, চুলের দুটো ঝুঁটি দুলিয়ে এসে হাজির। মনিবাবুকে দেখেই বললে, 'জান বাপি, আর পি র সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আমি তো ভয়ে কাঠ। আমাদের সকলের মুখেই তখন ফুচকা।' বলেই হেসে গড়িয়ে পড়ল বুর্ণাক।

'এতে হাসির কি আছে? ঢঙ।' সান্ত্বনা ধমকে উঠল। পরেই বললে, 'কলেজের মাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা হতে পারে না। যা—মশলার ডিবেটা বাপিকে দে—'

মনিবাবু জিগেস করলেন, 'ফুচা কোথায়?'

'বেরিয়েছে কোথাও।' সান্ত্বনা বললে।

বুর্ণাক পাশের ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কে ফুচা? ওকে তো দেখলাম গড়েহাটার দিকে যেতে।'

মনিবাবু আবার বললেন, 'গ্যাসের খবরটা দিয়েছে!—'

সান্ত্বনা বললে, 'ওদের ফোন নাকি খারাপ।'

'সে তো আমি জানি। বেরোবার আগে আজ বলে গেলাম, তোমার ছেলেরা আজকাল যা হয়েছে না!'

সান্ত্বনা বললে, 'জানই তো ওদের। নিজেরটি হলেই হল।'

মনিবাবু আর কথা বাড়ালেন না। কোথা থেকে কোথায় গিয়ে ঠেক খাবে বলা যায় না। মশলার ডিবেটা খুলে এক চিমটে যোয়ান মুখে পুরেই বলে উঠলেন, 'ইস্ দাঁতটা কিছুতেই আর দেখানো হচ্ছে না গো—' একটু থেমে ডাকলেন, 'বুণি! ও ঘর থেকে—আমার হাত ব্যাগটা দাও তো—'

বেশ কিছুকাল হল মনিবাবু মাথা গোঁজা একটা বাড়ি তৈরী করার কথা ভাবছিলেন। মাঝে মাঝে এ সব আলোচনা সান্ত্বনার সঙ্গে হয়েছে আগেও। তা এবার মনিবাবু উঠে পড়ে লেগেছেন। রিটায়ার করার আগেই করে ফেলবেন ঠিক করেছেন। এমন কি তেত্র'টে ঠিকাদার ভঞ্জবাবুকেও নাকি কথাটা বলে রেখেছেন। এ সব কথা সান্ত্বনা বহুবার শুনেছে। শুনে শুনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

সে দিন আপিস থেকে বাড়ি ফিরেই বললেন, 'আর তো হয়ে এলো। কটা বছর। জান 'পরেশ ভটচায মাণিক দত্ত এদের সব বাড়ি কমপ্লিট হয়ে গেল।'

সান্ত্বনা উত্তরে বললে, 'ও সব জেনে আমার লাভ? আমার যে দিন হবে সেদিন জানব।'

'এই তো! এই জন্যেই তো মুশকিল। একটা আলোচনা'—

সান্ত্বনা কথার মাঝেই বলে উঠলেন, 'না, আলোচনা' করে বাড়ি হয় না। তোমার মতো যারা নিষ্কর্মা 'শুধু তারাই স্ত্রীর কানের কাছে ভ্যাজর ভ্যাজর করে—জানো, অমুকে বাড়ি তুললে, তমুকে জমি কিনলে—'

মনিবাবু সাধারণত এ রকম অবস্থায় চুপ করে যান। আজকে বাড়ি ফিরেই তাই আর কোন রকম আলোচনায় বসলেন না। হাত ব্যাগটা টেনে নিয়ে রোল করা কাগজটা টেবিলের ওপরে রাখলেন 'গিন্নীকে ডাকলেন—'শুনচো, দেখো।'

সান্ত্বনা চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বললে, 'এটা কি?—'

মনিবাবু অল্প হেসে বললেন, 'এটাই তো সেই—নক্সা। দেখ! এ দিকটা উত্তর, এটা দক্ষিণ। কেমন? এবারে—'

সান্ত্বনা বাধা দিলে, 'ঘরগুলো সব কত বড়? এ রকম?' নিজের ঘরের মাপটা দেখালে সান্ত্বনা।

মনিবাবু বললেন, 'না ঠিক এত বড় নয়। তবে বড়। দেখো না, দশ ফুট বাই বারো—'

'ও সব ফুট মুট বুঝি না। মোট কথা আমাদের এই ঘরের থেকে ছোট, এই তো?'

মনিবাবু ঘাড় নাড়লেন, তারপর বললেন, 'এইটা তোমার ভাঁড়াড়, এটা রান্না, আর এই দেখো এটাচড্‌ বাথ যেটি চাও।'

সান্ত্বনা ওসবের উত্তর দিলে না শুধু বললে, 'ঘর সবই ছোট হয়ে গেছে।'

'কই! এমন তো ছোট নয়। আর তা ছাড়া তোমার জমি যেমন তেমন তো হবে।' মনিবাবু থামলেন। আবার বললেন, 'এই তেই ফতুর হতে হবে। ইঁট কাঠের যা দাম বাড়ি আর করতে হবে না কাউকে বুঝলে?'

'না, সবাই তোমার গাছ তলায় থাকবে।'

মনিবাবু আপত্তি জানালেন, আরে, না, তা কেন? যা-এ্যাসটিমেট তাতে বেশ খরচা পড়বে!...'

'তা বিনি পয়সায় হবে না কি?'

উত্তরে মনিবাবু বললেন, 'না না। তা নয়। তবে দু'টো ইউনিট বলেই খরচটা কিছু বেশি পড়েছে—'

সান্ত্বনা অবাক, 'দুটো ইউনিট? সে আবার কি?'

মনিবাবুও আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আরে দুটো ইউনিট, মানে দুটো ফ্ল্যাট। একটায়। থাকবে, আর একটা ভাড়া দেবে।'

সান্ত্বনা ঝাঝিয়ে উঠল, 'আবার ভাড়া? চারকাল কাটলে ভাড়া বাড়িতে। আবার নিজের বাড়িতেও ভাড়া?'

মনিবাবু শান্তভাবেই বললেন, কলকাতা সহরে সব মিঞাই দেয়। লোকে একখানা ঘর করলে আধখানা দেয়। বুঝলে?' মনিবাবু সিগরেট পাকাতে পাকাতে নিজের মনেই বললেন, 'নাঃ নিজের মনের মতো বাড়িটাও করা যাবে না দেখছি!'

ব্যস্। আর যায় কোথায়। সান্ত্বনা ফোঁস করে উঠল, 'বাড়ি আমার। আমার পছন্দ মতো নক্সা হবে। যেমন বলব তেমন হবে। এই

যে পায়রার খোপ—সাত জন্মেও অমন ঘরে থাকি নি।'

মনিবাবু প্রমাদ গুণলেন, 'তা হলে কলঘর আর রান্নাঘর ছোট করে, এদিক দিয়ে একটা দরজা ফুটিয়ে—'

সান্ত্বনা যেন আরো রেগে গেল, 'হু', এক চিলতে বাথরুম আর দেড় হাত রান্নাঘর নিয়ে এটা কমিয়ে, সেটা বাড়িয়ে—এই করছে সারা সন্ধ্যে।...'

'তা তোমার যদি কোন কিছুই পছন্দ না হয় তা কি করি বল? একটা কিছু তো বলবে!' মনিবাবু বিরক্ত হলেন।

সান্তনা রেগে গেল। বললে, 'সারাটা জীবন কষ্ট করে কাটালুম। এখন একটা নকসা এনে, বুড়ো বয়সে মকসো করছে। সাতটা কাজের কথা রইল। ছেলেটা গোল্লায় যেতে বসেছে। কোন কিছুর হুঁস নেই, একখানা নক্সা এনে—'

রুণকি এর মধ্যে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে। নক্সাটা অনেকক্ষণ দেখে পুব দিকের ঘরটা দেখিয়ে বললে, 'এই ঘরটা কিন্তু আমার।'

'মেয়ের কথা শুনলে? বাড়ির সেরা ঘরখানি ওঁর চাই!' রুণকি বললে, 'না তো কি—'

মনিবাবু সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকালেন।

ঠিক এই সময়ে লোড শেডিং হল। সারা পৃথিবী যেন নিমেষে একটা অন্ধকারের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো। টর্চটা হাঁতড়ে খুঁজে পেতে নিয়ে এল রুণকি। তারপর ও ঘর গিয়ে—'বাতি কোথায়, মা-মনি? বাতি—' বলে চেঁচাতে লাগল।

সান্তনা বললে, 'খুঁজে দেখ্ কোথায়। সব কাজে মা-মনি আর মা-মনি!'

তিন হাজার বছরের উত্তরসাধক একটা মোমবাতিকে এনে রুণকি টেবিলে জ্বালিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে সারা শহরের প্রতিটি বাড়ির দেউটি থেকে পিদিম জ্বলে উঠল। যেন কালীপুজোর আগের রাতে চোদ্দ পিদিমের মোচ্ছব। মোমবাতির ঘুমন্ত আলোয় নাকে চশমা লাগিয়ে নকসার ওপর ঝুঁকে পড়লেন মনিবাবু।

ফুচা এতক্ষণ ছিল না। ইতিমধ্যে কত কি যে হয়ে গেল তার খবর সে জানে না। নকসাটা খানিকক্ষণ দেখে পুব দিকের ঘরটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, 'এই ঘরটা আমার'—

পাশের ঘরে রুণকি ছিল। ছুট্রে এসে বললে, 'এ-রে, দিচ্ছে!

আমার কখন বলে নেওয়া হয়ে গেছে! উনি এখন এলেন।'

'ও সব জানি না। ওই ঘর আমার।' বলেই ফুচ্চা বেরিয়ে গেল।

মনিবাবু ঘাড়টাকে জিরাফের মতো লম্বা করে নকসার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা দেখো, সামনের বারান্দা যদি না দিই—'

সান্তনা রেগে বললে, 'রেখে দাও তো ওসব। পাখা বন্ধ। আলো নেই। মাথার ঝিঁটকি নড়ে গেল। চোখ ঠিকরে আর ও সব দেখতে হবে না।'

'কেন এ তো বেশ দেখা যাচ্ছে!'

'দেখে আর কাজ নেই। হাত পাখাটা দে রুণকি।'

'তোমরা তো দিব্যি আপিসে কাটাচ্ছ। দুপুরে আমাদের কি অবস্থা হয় বুঝতে হবে না।'

মনিবাবু তখনো মনোযোগ দিয়ে কি সব ক্যালকুলেশান করছেন। সান্তনা চেঁচিয়ে উঠল, 'কানের মাথা খেয়েছ নাকি? শুনতে পাচ্ছ না?'

মনিবাবু তাকালেন। হেসে বললেন, 'বলো।'

'বলব আর কি। আচ্ছা এর কোন বিহিত নেই? রোজ রোজ এ কি? এ্যা। আজ বাদে কাল ছেলেপিলের একজামিন।'

মনিবাবু ঘাড় নাড়লেন। বললেন, 'সত্যি এর কোনো সুরাহা হচ্ছে না। তাই তো দেখছি।'

সান্তনা আপত্তি করলে, 'নাঃ হচ্ছে না?'

মনিবাবু না হেসে পারলেন না।

রুণকি বললে, 'মা-মনির এক কথা। পাবে কোত্থেকে? অত ইলেকট্রিসিটি যে তৈরি হচ্ছে না।'

সান্তনা ধমকে উঠল, 'থাম। বাপের কাছে আর সোহাগ করতে হবে না। দুপুরে কলেজ থেকে ফিরে আকু পাকু করিস কেন? তখন এত জ্ঞানের কথা মনে থাকে না?'

মনিবাবু মায়ে ঝিয়ে ঝগড়ার মধ্যে আর গেলেন না। বললেন, 'তোমার তো একার নয়। প্রায় ধরো না সারা কলকাতা। আমাদের কারখানা তো বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়।'

এই আদিম অন্ধকারের মধ্যে ট্রাম গাড়িটা আলো জ্বালিয়ে চলে গেল। রাস্তার মোড়ে ঠেলাগাড়ি। বাতি জ্বলছে। ডিস কেনাকাটা চলছে। উঁহু টাং, উঁহু ঠাং কাঁচের ঠোকাঠুকি। তার সঙ্গে 'টাকায় চার

টাকায় চার···এক ঘেয়ে হেঁকে চলেছে।

রুণকি আরো একটা বাতি এনে জ্বালিয়ে দিলে। ঘরের আলোটা জোরাল হল। নকসার পাতা থেকে মনিবাবুর চোখ সরেনি। আলোটা জোর হতেই বললেন, 'দেখো, এদিকের ঘরটা—'

সান্তনা রীতিমত রেগে গিয়ে বলল, 'আবার ওই এক কথা। বলছি ও সব রেখে দাও। ইন্সিওরের টাকাটা দেওয়া হয়েছে?'

মনিবাবু ঘাড় নাড়লেন।

সান্তনা আবার বললে, 'জমিটা রেজিস্টি হয়েছে?'

মনিবাবু নকসার ওপর থেকে চোখ সরালেন। তারপর সান্তনার দিকে চেয়ে বললেন, 'না। কাল বায়না হবে।'

আর যায় কোথা। সান্তনার হাত পাখা বন্ধ। অবাক। ভীষণ রেগে উঠল। আগুন হয়ে বললে, 'কাল তোমার বায়না হবে? এখন কেনাই হয়নি? সত্যি!—'বলেই গালে হাত দিয়ে সান্তনা মনিবাবুকে দেখলে। একটু থেমেই বললে, 'দেখ তো কিভাবে সময়টা নষ্ট করলে।'

'নষ্ট করলাম কোথায়—?' প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনিবাবু বললেন।

'নষ্ট নয়? জমিই কেনা নেই, একটা নকসা এনে—'

মনিবাবু বললেন, 'কেনা নেই, কেনা তো হবে।'

'হবে!' বলেই সান্তনা নকসাটা টেনে নিতে গেল। মনিবাবু নকসাটা চেপে ধরতেই সান্তনার কুনুই লেগে জ্বলন্ত বাতিটা উলটে গেল।

আর ঠিক এই মুহূর্তে পটাপট সব ঘরের টিউবলাইটগুলো এক সঙ্গে জ্বলে উঠল। ছেলে মেয়েরা হৈ হৈ করে উঠল। বাতির আগুনটা এই তালে নকসার কাগজটায় ভর করলে। কাগজটা জ্বলে উঠতেই মনিবাবু, 'ইস্! গেলো গো গেলো!' বলেই কাগজটা বাঁচাতে গেলেন।

মুষড়ে পড়া মন নিয়ে পোড়া নকসার কাগজটা দেখতে লাগলেন মনিবাবু। সান্তনা আর দৃকপাত না করে নিজের ঘরের পাখা খুলে শুয়ে পড়ল।

বসার ঘরে বসে মনিবাবু অনেকক্ষণ ধরে সিগরেটে টান দিতে দিতে চোখ দুটো বুজে কি ভাবছেন। পোড়া নকসার কাগজটা সেনটার টেবিলে আধখোলা হয়ে চিতিয়ে আছে। সিগরেটের ধোঁয়ায় ঘরটা ভরপুর।

দায় আর দায়িত্ব। সারা জীবন এদের কাছে ছুটি নেই। কর্তব্যের বেড়া জালে নিজেকে বেঁধে রেখে মনিবাবু ভাবছিলেন: মানুষের জীবনেও হয় তো মাঝে মাঝে লোডশেডিং-এর প্রয়োজন আছে।

খাবার ঘরের দেয়াল ঘড়িতে টিং টিং শব্দে নটা বাজল।

কবিতা

শূন্যসময়

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়

যারা ঘুমিয়ে আছ
থাকো
যারা এখনও জেগে আছ
থাকো

আমার কিছু বলার আছে
আমি নিজেই
শুনব বলে তৈরী হয়ে আছি
তৈরি হয়েই থাকো

শুধু
কিভাবে বলা হবে
এবং কখন
এবং কাদের

ততক্ষণ
ঘুমিয়ে থাকলে
জেগে থাকলে
থাকো

এ ভাবেই তৈরি থাকতে হয়

আলো নেই আলো নেমে গেছে

সৌম্য দাশগুপ্ত

পাড়ার সবাই ফুঁপিয়ে উঠলে আমিও একটু কেঁদেছিলাম
মা বলেছিল এমনটাই নিয়ম

জলার আয়নায় থাবা বুলিয়ে ঝুঁকে আছে যে বুড়ো বট
সবার চোখে তার কোলের মতন তরল ভেসে ওঠে—
গাঢ় অন্ধকার লাফ দিয়ে ওঠে শুশুকের মতো

সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল হয়ত এমনটাই মানুষ কাঁদে
কেননা সে বছর হেসে উঠেছিল জলপ্রবাহ

সেবার অগাধ জলে আল গিয়েছিল ডুবে, আর
বস্তায় বস্তায় কারা হীরে তুলেছিল ক্ষেত থেকে

সতী দিদির মা বলেছিল
আলো নেই আলো নেমে গেছে
আর সমবেত দেশীয় রাত্রি উঠে এল

উঠে এসেছিল মাঠের ওপার হতে আলকাতরার মতন, আর
আমরা তখন গোরুর গাড়ির ঝাঁপের ভেতর।

সেই বছর সত্যিকারের জন্ম হয়েছিল আমার ॥

চেতনা

শান্তনু চট্টোপাধ্যায়

বিছানায় এলানো ক্লান্ত দেহ
চোখে ঘুমের হতাশা
ভগবান যথারীতি চাঁদের আলোর সুইচ
নেভাতে ভুলেছে
রাস্তাগুলো বুকে করে
জমাট অন্ধকার, ধরে রেখেছে
ল্যাম্প পোষ্টগুলো বিশ্রাম করছে।

সোজা রাস্তার ওপর, হঠাৎ উঠে যাওয়া ব্রিজগুলো
গর্ভবতী জননীর স্ফীতদোর
বেদনাগুলোকে পদদলিত করা
প্রেরণার উদ্দেশে মোমবাতি জ্বালানো—
বড্ড পুরনো হয়ে গেছে, নতুনত্বের স্বাদ নেই
"পৃথিবী কি নতুন পথে ঘোরে ?"
"কে" ?
"ও, বিবেকবাবু ! কিন্তু আপনার তর্কে লাভ নেই"
ঘুম আসছে
পরের দিনের অঙ্কটা একই ফর্মুলায়
ফেলা, প্রস্তুতি চলছে।

ন্যায় সৈনিকের উপলব্ধি

অভনু সেনগুপ্ত

আমি জানি সে কখনো আমায় ভুল বুঝবে না
জ্বলন্ত চোখের অগ্নিদৃষ্টিতে
নির্বাকে অজস্র তপ্ত বাক্যের লাভা
ঢেলে দেবে না আমার ওপর
অজস্র বাঁকা প্রশ্নের ফলা দিয়ে
চিরে চিরে জর্জরিত করবে না আমায়
নিরপরাধ রক্তে অপরাধীর গন্ধ ছড়িয়ে
জানতে চাইবে না
এই মাটির নিষিদ্ধ কালো গহ্বরগুলিতে
কেন প্রবেশ করেছি বারবার

আমি তাই বিচলিত নই একটুও
আমার দৃঢ়তার উৎস সে
এই দ্বিখণ্ড দেশের
বিষাক্ত কারাগারে আটক আমাকে
শক্তি দেবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ॥

রিমার হঠাৎ

অভনু মজুমদার

ট্রামটা মৌলালীর মুখে এসে থামতেই পরেশ অস্বস্তিতে পড়লো। দু-একবার, পেছন দিকে, ঘাড় ঘুরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। তারপর সিট ছেড়ে উঠে পড়লো। ট্রামটায় একেবারে অফিস ছুটির ভীড়। পরেশ বুঝতে পারলো না, রিমা এখানে নামবে কিনা। নামতেও পারে। পরেশ আজ, ডিপো থেকে ওঠবার সময় রিমা'কে বলতে ভুলে গেছে যে ওরা নীলরতনের সামনেই নামবে আরেকবার থুত্‌নি উঁচু করে ও গেটটা দেখবার চেষ্টা করলো। দু-একজন ভদ্রমহিলা, ভুরু নাকে কুঁচকে, বুকের আঁচল সামলতে-সামলাতে নেমে গেলেন। যাক্, রিমার তাহলে খেয়াল আছে। পরেশ, ঘাড় নামিয়ে, সামনের ভদ্রলোকের পিঠে আঙুল ঠেকিয়ে বললো, 'দাদা, এটু সাইড দেবেন···'

আসলে পরেশ আর রিমা কদাচিৎ একসঙ্গে এ পথে যাতায়াত করে। রিমার বরাবর অভ্যাস মৌলালীর মোড়ে নেমে পড়া। কিন্তু পরেশ সঙ্গে থাকলে, রিমা'কে নীলরতনের স্টপটায় নামতে হবে। এনিয়ে পরেশের রীতিমত ছেলেমানুষী জেদ কিন্তু রিমার প্রায়ই ভুল হয়ে যায়, তাই পরেশ ওঠবার আগে ওকে একবার শুনিয়ে দেয়, 'নীলরতনে নামবো বুঝলে।'

শরীরটাকে চাপ্টা করে নিয়ে, পরেশ গেটের সামনেটায় কোনরকমে এসে দাঁড়ালো। নেক্সট্ স্টপেজে নামতে হবে। পরেশ লেডিজ সিটগুলোর দিকে বিরক্তি নিয়ে তাকালো। কি হলো! রিমা এখনো উঠছে না কেন? শরীরটাকে আরেকটু ঝুঁকিয়ে, প্রায় উঁকি দিয়ে দেখলো, রিমা গালে আঙুল ঠেকিয়ে দিব্যি চোখবুজে বসে রয়েছে। ওর শরীরটা ট্রামের ঝাঁকুনিতে অল্প দুলছে। পরেশের চোয়াল শক্ত হ'ল। এক্ষুনি স্টপেজ এসে পড়বে, নামতে হবে, অথচ কোন হুঁস নেই। কি করবে? এখান থেকে গলা তুলে ডাকবে ওর নাম ধরে? এই ডাকাডাকির ব্যাপারটাই কেমন অস্বস্তিকর লাগে পরেশের কাছে, আরেকটু ঝুঁকতে কণ্ডাকটর বললো, 'কি! কি হলো কি! ভেতরে কেউ আছে?' ভুরু-কুঁচকে ও কণ্ডাকটর-এর দিকে তাকালো, 'ঠিক আছে, দেখছি।' শেষ পর্যন্ত, দাঁত কিড়মিড় করে, কোন

রকমে তাকালো, 'এই যে, অ্যাই রিমা।'

দু-একজন ভদ্রমহিলা ওর দিকে ফিরে তাকালেন। পরেশ হাত নাড়লো; 'একটু ডেকে দিন তো। ওকে্, হ্যাঁ-হ্যাঁ···'

রিমার কাঁধে ভদ্রমহিলা হাত ঠেকাতেই ও চমকে উঠলো। 'আপনাকে ডাকছেন', ভদ্রমহিলা পরেশ'কে দেখালেন, 'নামবেন তো'?

'আঁ! ওহ।' রিমা পরেশ'কে দেখতে পেয়ে, ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে সামান্য বিব্রত হ'ল। অপ্রস্তুত, বোকার মত হাসলো। তারপর তাড়াতাড়ি, পরেশের দিকে না তাকিয়ে গেটের সামনে হুমড়ি খেয়ে এসে রড ধরে বললো, 'আরে আমার খেয়াল ছিলো, ঠিকই নামতাম।'

ট্রামটা থামলে ওরা নামলো। জামার হাতা ঠিক করতে করতে পরেশ একটু রুক্ষ স্বরে বললো, 'এরকম একটা ফানি পজিশনে ফ্যাল কেন, আঁ?'

'কিসের ফানি পজিশন?' রিমার ভুরু বেঁকে উঠলো।

'স্টপেজ আসলে একটু খেয়াল রাখতে পারো না···।'

'আরে' বলছি তো আমার খেয়াল ছিলো, ট্রামের ঝাঁকুনিতে চোখটা সামান্য···।'

'একগাদা লোক, তার মধ্যে নাম-ফাম ধরে চেল্লানো হুঁঃ, ও আমার পোষায় না।'

'পোষায় না! আর তুমি তো মুখটা এমন করো, গিদিবিচ্ছিরি। ভদ্রমহিলা কি ভাবলেন বলতো। ব্যাপারটা নর্মাল। ডাকলে হয়েছেই বা কি?'

'ন্‌না, ওসব পারবো না। নিজে খেয়াল রাখবে।' পরেশ ওর ঈষৎ খাড়া নাকের ডগায় আঙুলটা ঘষে রাস্তায় নামলো রিমা, সামান্য বিড়-বিড় করতে-করতে, আঁচল সমান করে, পরেশের সঙ্গে ব্যবধান রেখে নিজের মত রাস্তা পার হ'ল।

গলিটার মুখে মিষ্টির দোকানটা একইরকম রয়েছে। পরেশ হিপ্ পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করলো। পাশে সেই ষ্টেশানারী দোকানটা আর নেই।

'দেখেছো, লোহার কারবার শুরু হয়ে গেছে।' পরেশ ইচ্ছে করে হেসে, রিমাকে আঙুল দিয়ে পাশের দোকানটা নির্দেশ করলো। কিন্তু রিমার মুখের থম্‌থমে ভাবটা তাতে খান্ খান্ হলো না। নাকে উগ্র ঘি মিশ্রিত উৎকট গন্ধটা ভীষণ লাগছে।

'কোনটা নেওয়া যায় বলতো?' পরেশ, কাঁচের সো-কেসে, মিষ্টিগুলোর ওপর চোখ ঘোরাতে থাকলো।

'কি হলো! কোনটা বল? ক্ষীরকদম্ব না কমলভোগ উঁ! আর

ইয়ে, বুঝার জন্য একটু বোঁদে নিয়ে নি, খেতে ভালোসে।' পরেশ রিমার দিকে তাকালো। রিমা এবারেও কোন উত্তর দিলো না। অতএব পরেশ বললো, 'দাও হে, দশ টাকার ক্ষীরকদম্ আর আড়াইশো গ্রাম বোঁদে দিয়ে দিয়ে দাও। দোকানের ভেতরের, চোখ-জুড়নো, সফেদ-তাকিয়াওয়ালা গদিতে এক নাদুস-ভুঁড়িওয়ালা ছোকরা বসে কোঁচার খুঁটে এক মনে সোনার ফ্রেমের চশমা মুছছে। আগে ওখানে মাণিকবাবু নিজে বসতেন। খুব রোগা-সোগা ছিলেন। দেখে মনে হতো না তিনি একটি আস্ত মিষ্টির দোকানের মালিক। সে বুড়োর ছবিতে, বাসি মালা দুলছে পাখার হাওয়ায়। পরেশ দেখলো, বিক্রেতা ছোঁড়াটার গায়ে-গতরে বেশ লোক লোক ভাব এসেছে। 'চ্যাক্' করে কাঁচের ওপর খুচ্‌রো পয়সাগুলো ফেলে ছেলেটা পরেশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'হ্যাঁ বলুন দাদা।' তারপরই একমুহূর্ত ছেলেটার চোখের পাতাগুলো কেঁপে উঠলো। ঠোঁট দুটো বিস্ফারিত হ'ল। চোখ দুটো ছোট হ'ল। পরেশ বললো, 'কিরে লক্ষ্মী চিনতে পারছিস্ অ্যাঁ?'

'আ-জ্ঞি স্নে আপনি, হি-হি, ভালো আছেন তো?'

'হ্যাঁ রে ভালো আছি। এখানের বাড়ীটা ছোট-ভাইটা একমাস হ'ল নিয়েছে। একবার দেখা করতে এলাম। নে দে বাবা, ক্ষীরকদম আর ওই বোঁদে একটু দিয়েদে।' লক্ষ্মী পরেশের হাত থেকে টাকাটা নিয়ে লাজুক চোখে একবার রিমাকে দেখে নিলো।

গলির ভেতর ঢুকে পরেশ মিষ্টির প্যাকেটটা রিমার হাতে দিলো।

'খুব সামান্য কারণে এত বড় হয়ে যাও কেন!' পরেশ, সময় নিয়ে, টেনে টেনে বললো। ওর হঠাৎ মনে হল, ট্রাম থেকে নেমে চেপে গেলেই ও ভালো করতো। এর আগেও তো এরকম ব্যাপার ঘটে গেছে। কিন্তু··· ! তবু··· ?!

গলির বাঁ-পাশ ধরে সেই বিহারীগুলোর আস্তানা।···সেই বুড়োটা নাই! আশ্চর্য্য! পরেশের দৃষ্টি এবার রীতিমত হোঁচট খেল। খুব আস্তে-আস্তে রিমার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কে হেসে বললো, 'বাব্বাঃ, এখনো বেঁচে আছে।' রিমা বুঝতে পারছিলো না, বুড়োটা ঠিক ওকেই দেখছে কিনা। কিন্তু আতশ-কাঁচের চশমাওয়ালা, সাদা কদমফুলের মাথাটা ধীরে-ধীরে ওদের গন্তব্যের দিকেই ঘুরছিলো।

আর দু-পা এগোলেই গলিটা ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। এবং বাঁকের মুখে প্রথম বাড়ীটাই। পরেশ বললো, 'দ্যাখ্, আবার আছে কিনা।' মাথা তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলো দোতলার বসার ঘরের জানলাগুলো খোলা। গলির বাড়ীগুলো অসম্ভব গায়ে-গায়ে। পরেশ'কে তাও দরকারে

মাঝে-মাঝে এ পাড়ায় আসতে হয়েছে। কিন্তু রিমার মনে হ'ল গলিটা যেন আগের চেয়ে আরো সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেছে। তাপসদের বাড়ীর দিকে তাকিয়েই রিমার বুকের ভেতরটা চাপা অস্বস্তিতে কেমন করে উঠলো। জানালার গরাদগুলো ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আর কাঠের দরজা-জানলাগুলোয় যেন মরচে ধরেছে। অথচ তাপসরা যে কি করে··· ! গলির বাঁকে পৌঁছতেই চোখ দুটোকে ও জোর করে মাটির দিকে চেপে রাখলো। আশে পাশের বাড়ীগুলোর বারান্দায় আর রকে দশবছর আগের চেনা মুখগুলো। ওদের সাথে রিনা এখন কি কথা বলবে! রিমা বুঝতে পারছে অনেকগুলো দৃষ্টি ওর শরীর ছুঁয়ে ঠিকরে যাচ্ছে। কি করবে রিমা! মুখ তুলে হাসবে। কিন্তু ওরা যদি না হাসে। রিমা দ্রুত রকে উঠে পড়লো। রকের ওপর, একতলার টুলুদের ঠাকুমা চেয়ার পেতে বসেছিলেন। রিমা আরো দ্রুত, যন্ত্রের মত, দোতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। ভদ্রমহিলা মুখ তুললেন। পরেশের পা-দুটো তবু আটকে গেল। হাসলো, ভালো তো?'

ভদ্র মহিলার চোখের খাঁজ কুঁচকে উঠলো। মাথা কাৎ করলেন, 'তোমরা?'

'একরকম। সুরেশের কাছে একটু এলাম আর কি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'

'উঁ, ঠিক আছে পরে দেখা হবে।'

দোতলার সিঁড়ির কাছাকাছি এসে পরেশের নাকের পাটা দুটো সচকিত হ'ল। সারা সিঁড়িটাই সেই পুরনো পরিচিত গন্ধটায় ভর্তি। ধাপগুলোয় স্যাঁত-স্যাঁতে অন্ধকার। একটু সময় লাগলো। সিঁড়ির কোণটা দেখতে। কিন্তু না; কোন কুকুর-টুকুর তো নেই। মতি তো বহুদিন আগেই মরে গেছে। পরেশরা যখন এখানে থাকতো তখন পরেশ রোজ নাকটিপে সিঁড়ি দিয়ে যাতায়াত করতো। মতির গায়ে অসম্ভব পোকা ছিলো। তারই দুর্গন্ধ। তাড়ানো যেতনা। মতির মালিক তিনতলার ঘোষবাবু। ওরা আদ্দিকালের ভাড়াটে। কিন্তু গন্ধটা এখনো '···

'কি হলো, বেল দাও।' কি, কারেন্ট নেই? বলতে বলতে পরেশ নিজেই বেলটায় চাপ দিলো। তারপর বললো, 'নেই বোধ হয়।' রিমা কড়া নাড়লো। কড়ার শব্দ। তারপরই দরজাটা থর থর করে কেঁপে উঠে খুলে গেল। গালভর্তি সেভিং লোশনের ফাঁক দিয়ে সুরেশের দাঁতগুলো চিক্-চিক্ করে উঠলো।

'এসো, এসো।' সুরেশ দরজার পাল্লাটা পুরোপুরি টেনে ধরলো। রিমা দেখলো নীতা বসার ঘরের পর্দার ফাঁক দিয়ে হাউস্-কোট পরা অবস্থায় চট

করে গলে গেল ওদিকে। পরেশ গুন্‌গুন্‌ করতে করতে চটি খুলে বসার ঘরে ঢুকলো। সুইচগুলো অফ-অন করে জিজ্ঞেস করলো, 'কিরে, কারেন্ট নেই ?'

'অর বলো না। সকাল দশটায় গিয়েছে তারপর……।'

'হুঁ। যা না, তুই কাজ সেরে আয়।' পরেশ চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করলো।

'নি না, ঠিক আছে। বসুন, বৌদি।' সুরেশ চেয়ারটা এগিয়ে দিলো। রিমা মিষ্টিটা ওর হাতে দিলো।

'কি! বাবা, আপনার না—থ্যাং।'

'থ্যাত কি ? ও তোমাদের জন্য নয়। ওটা বুয়ার। ইয়ে নীতা কোথায় গেল ?'

'আছে তো ; আসছে।' সুরেশ প্যাকেটটা নিয়ে ভেতরে গেল।

বাড়ীটা তো পুরনো। ঘরের দেওয়ালটাও সেই কারণে বেশ ফাঁপা, ফাঁপা। নতুন রং করা হয়েছে। কিন্তু জায়গায় জায়গায় রং ঠিক মতো বসে নি। কেমন যেন ভিজে ভিজে ভাব। তবু বেশ ছিম্‌-ছাম্‌ ভাবে সাজানো-গোছানো। রিমা ডিভানটায় বসে মন দিয়ে জিনিষ পত্তরগুলো দেখছিলো। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছিল পরেশের। সোফার গদিটা ভয়ানক নরম। পাছা ঠেকালেই শরীরটা সোফার খাঁজে লুকিয়ে পড়তে চায়। এ ভাবে বসে জুত করে ও সিগারেটটা টানতে পারছিলো না। আবার পায়ের নীচের কার্পেট যেন চোরাবালি। মাঝখান থেকে, এ অবস্থায়, পরেশের নিজের শরীরটাই কেমন ভারী ঠেকলো। ও বাধ্য হয়ে উঠে গিয়ে বেতের চেয়ারটায় বসলো। 'কি করেছে কি সুরেশ! এই ঘরে, এই সমস্ত……।' পরেশ কার্পেটটা দেখালো।

'কেন ?' রিমা বললো।

'ধুর্‌, ছোট ঘরে এসব গদি ফদি। কোন দরকারই ছিলো না। জরুর জং।' পরেশ, অভ্যাসমত, নাকের ডগা ঘষলো।

'নি না। আসলে ওদের বোম্বের কোয়াটারের ঘরগুলো বড়-সর ছিল তো। ঠিক সেই ভাবে সাজাতে চেয়েছে। কার্পেট অবশ্য না থাকলেও চলে।' রিমা কথাগুলো বলে দরজার দিকে অসহিষ্ণু ভাবে তাকালো। নীতা-সুরেশ কি করছে কি ? ও ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর মাড়িয়ে রান্না-ঘরের মুখে আসতে দেখলো, নীতা গ্যাসের টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্লেটে কি সমস্ত সাজাচ্ছে। রিমার ঠোঁট বেঁকে উঠলো। একেবারে

মিষ্টির প্লেট নিয়ে ঢুকতে হবে, নিজের দাদা-বৌদির সঙ্গে এত ফরম্যালিটির কি আছে! সুরেশ গেঞ্জি গায়ে, গেলাসগুলোয় জল ভরছিলো। রিমা দরজার কাছ থেকেই বললো, 'অ্যাই তোমাদের আক্কেলটা কি বলতো।' নীতা সুরেশ দুজনেই ঘাড় ঘোরালো। রিমা এগিয়ে এলো। নীতার হাত থেকে মিষ্টির থালাটা ঝনাৎ করে নামিয়ে রেখে বললে, 'আচ্ছা, এসব কি হচ্ছে অ্যাঁ! এই তো বাবা ঢুকলাম। এখনই তাড়াবার ধান্দা। চলো তো, বসবে চল। ওসব পরে হবে আশ্চর্য্য তোমাদের—।' রিমা নীতার হাত ধরে টানলো। নীতা বললো, 'আরে ঠিক আছে। যাচ্ছি, যাচ্ছি। যাচ্ছি তো—এই দ্যাখ।' কিন্তু রিমা ওকে এত জোরে টানছিলো যে ও বাধ্য হয়ে সুরেশ'কে বললো, 'অ্যাই, প্লেটগুলোর ওপর ঝুড়িটা চাপা দিয়ে এসো।'

ওরা সবাই ঘরে বসলো। রিমা বসেই বললো, 'নীতা আমাদের দেখে শোয়ার ঘরে দৌড়েছিলো হাউস-কোট ছাড়তে।' তারপর নীতার দিকে তাকিয়ে হাসলো, 'কেন রে, এত লজ্জা কিসের। আমিও তো প্রায় চবিশ ঘণ্টা বাড়ীতে ওই পরে থাকি। কে বাবা শাড়ী-ফাড়ি পরে বারান্দা রান্নাঘর করবে। ছেলেরা, গরম লাগলে, অনায়সে গেঞ্জি খুলে ফেলে শুধু আণ্ডার ওয়ার পরে থাকতে পারে, আর আমাদের ?' নীতার কানের পাতাগুলো চিরবিড় করে পুড়ছিলো। ভাসুরের সামনে দিদিভাই এমন ভাবে কথা-গুলো বলছে। নীতা লজ্জায় মাটি থেকে চোখ সরাতে পারছিলো না। অনাবশ্যক ভাবে বুকের আঁচলটা টানলো। ভেতরটা, রিমার প্রতি একটা রাগ-রাগ বিরক্তিতে তিক্ত হয়ে উঠছিলো। রিমা পরেশের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমার দাদার সামনেও কোন লজ্জা নেই ও এসব ব্যাপারে একটুও কনসারভেটিভ নয়।' তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলালো, 'আচ্ছা নীতা, পাঁচ তারিখে এত জল-জমলো, সুরেশ'কে একবার আমার ওখানে পাঠাতে পারো নি। বেশ দিবা, দোতলার বারান্দায় বসে মুড়ি-তেলেভাজা চালিয়েছো, এদিকে আমরা একতলায়—।'

'কেন ? কি ব্যাপার। তোমাদের ঘরে জল ঢুকেছিলো নাকি ? পরেশ চোখ কোঁচকালো।

'আরে বাব্বাঃ! জল মানে ? ভাবতে পারবি না, পাঁচ তারিখ সকালে, সারারাত বৃষ্টির পর, কয়েক ঘণ্টা লাইট শাওয়ার হ'ল ন্যা, ওতেই ঘরের মধ্যে এই অবদি জল।' পরেশ দেওয়ালে আঙুল ঠেকিয়ে দেখালো।

'ওমা! তাই নাকি ?' নীতার ঠোঁটদুটো ফাঁক হ'ল।

'কিন্তু বিশ্বাস করো, আমার কোন আইডিয়াই ছিলো না যে বালিগঞ্জের মত অতো পশ এলাকায় এভাবে জল জমবে। না, মানে জল জমতেই

পারে ; তাই বলে ঘরের মধ্যে—।' সুরেশ হাসলো কিনা ও নিজেই বুঝলো না।

'আসলে, মানে একেবারে সবে বোম্বে থেকে এসেছি। গায়ের থেকে প্রবাসীর গন্ধ তো পুরোপুরি যায় নি। কি করে বুঝবো বলুন দাদা ?' নীতা বললো।

'না পরে অবশ্য,' সুরেশ আমার বললো, 'পরে অবশ্য খবরের কাগজে পড়েছিলাম কিন্তু তোমাদের ঘরের মধ্যে……। তা ইয়ে জিনিষ পত্তর কিছু নষ্ট হয়েছে বোধহয়।'

'না তার আগেই তোমার দাদা আর আমি মিলে জিনিষগুলো খাটের ওপর আর উ'চু জায়গায়—।'

ফ্রিজটা ?'

'তুলতে হ'ল।'

'আঁা ! ইয়ে তুললে মানে কোথায় রাখলে ?'

'কোথাও না, ওখানেই তলায় দু-চারটে ইঁট দিতে হ'ল।'

'অ', সুরেশের ঠোঁট গলে সহানুভূতি মাখানো আপসোসের একটা শব্দ বেরুলো।

"যাই ই বলো, তোমাদের কিন্তু একবার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিলো ইঁ"." রিমা স্পষ্ট নীতার চোখে চোখ রাখলো। নীতার চোখের অপ্রস্তুত পাতাগুলো কয়েকবার পিট্‌পিট করে উঠলো। ও কি বললে খুঁজেই পেলে না। পরেশ নড়েচড়ে উঠলো ধ্যাত্‌ ন্‌ না ওরাই বা বুঝবে কি করে। নতুন সবে কলকাতায় পা দিয়েছে আর তুমি—।'

নীতা বললো, 'আচ্ছা দিদি। এ বাড়ীটা তো বাবা তোমারই। এবার থেকে জল-টল জমতে শুরু করলে সোজা এখানে চলে আসবে। কেমন।'

'হুঁ. আর ওদিকে জিনিষপত্তর—।'

'কি আছে ? ওগুলো আগে থেকে একটু সিকিয়োর্ড হাইটে রেখে, মানে জল যে ঢুকবে সেটা তো তুমি গেস্‌ করতে পারবে।'

রিমা এ কথার কোন জবাব দিলো না। পরেশ প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বললো. 'আই এ কোথায় গেল—বুম্বা ?'

'ও তো নেই। গতকাল পাক্‌পাড়ায় গেছে। ওর দিদি এসেছিলো।' সুরেশ নীতাকে দেখালো।

'আজ ফিরবে না ?' রিমা জিজ্ঞেস করলো।

'না আজ আর বোধ হয় ফিরবে না।'

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলার পর হঠাৎ রিমা বললো, 'আচ্ছা এখনে।

মানে এই ঘরে, বাবুলির একটা সোফাকাম বেড ছিলো, ওটা দেখছি না তো ?'

নীতা আর সুরেশ একে অপরের দিকে তাকালো। রিমা বললো, 'তোমরা এখানে ওঠবার আগে বাবলি (রিমার বোন) আর ওর হাসব্যাণ্ড বছর খানেক এ বাড়ীতে ছিলো। তারপর বারাসতে বাড়ী করে চলে যাওয়ার সময় ওরা এখানে একটা সোফা ফেলে রেখে গেছিল। বলেছিলো পরে নিয়ে যাবে।'

সুরেশ মাথা নাড়লো, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ বুঝেছি। কিন্তু ওটাতো, এ পাড়ার, নির্মলদার বাড়ীতে।'

'নির্মলদার বাড়ীতে ! মানে ?' রিমার ভুরু দুটো আবার মারাত্মকভাবে বেঁকে উঠলো।

'কেন, দাদা তোমায় কিছু বলে নি ?'

'না। কি বলতো ?' রিমা একবার পরেশের দিকে তাকালো। সুরেশ পরেশের দিকে মাথা ঘোরাতে পরেশ গলা খাকারি দিয়ে, নড়ে চড়ে বসে, রিমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আরে সোফাটা ভেঙে গেছিল। কোন কাজে লাগছিলো না। নির্মলদা বললো যে ও ওটা ওর বাড়ীতে রাখতে পারে। সারিয়ে নেবে—।'

'তাই বলে তুমি ওটা ওকে দিয়ে দিলে।' রিমা বেশ অবাক হ'ল। বেতের চেয়ারে বসেও পরেশের এবার অস্বস্তি হ'ল। কিন্তু ও কব্জি উল্টে বললো, 'কি হবেটা কি রেখে ? জিনিষটা তো কোন কাজেই লাগছিলো না। নির্মলদা যদি—।'

'ন্‌না, কি হবেটা কি মানে ? ওটার মালিক তুমি ? পরের জিনিষ। ফট করে খবরদারি করতে গেলে, আশ্চর্য !'

পরেশ কি একটা বলতে যাচ্ছিল। রিমা ওকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো' 'আর তাছাড়া দিয়ে দেওয়ার সময় তুমি তো এ ব্যাপারে কিছুই বলো নি। কিছু জানবার প্রয়োজন বোধ করোনি। তুমি জানো, গতমাসে যখন বাবলির সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, ও জানতে চেয়েছিলো সোফাটা ঠিক আছে কিনা ? আর তুমি—'

'রাখতো। বিজিত (বাবলির স্বামী) ওটা ঠিকই নিয়ে যেত যদি ওটা ওর কাজে লাগতো। নইলে ওভাবে আস্ত একটা সোফা, কেউ পরে নেব বলে বছরের পর বছর ফেলে রাখে না।'

সুরেশ একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল। 'জানেন তো বৌদি জিনিষটা কিন্তু প্রায় ভেঙেই গেছিলো। ওরা বোধ হয় ওটা নিতো না। হয়তো নতুন একটা কিনতো।'

'ন্‌না। সেটা ওরা যা করতে চায় করবে। কিন্তু জিনিষটার ওপর তো

আমাদের কোন রাইট নেই। ওটা ওদের জিনিষ। দেওয়ার আগে অন্তত ওদের একটা খবর দেওয়া উচিত ছিলো। পরের জিনিষ নিয়ে দাতবা!' রিমার চোয়াল শক্ত হচ্ছিল।

নীতা কি বলবে বুঝতে পারছিলো না। ও বয়সে ছোট। ভাসুর জায়ের মধ্যে কথাকাটাকাটি। এসবের মধ্যে পড়ে ও বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকলো। সুরেশ ব্যাপারটাকে হালকা করবার জন্য আবার একটু শুকনো হাসি হাসলো। রিমাকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল পরেশের নাকের ডগায় ঘামের বিন্দুগুলো চিক্‌চিক্‌ করে উঠলো। রিমা সুরেশের দিকে তাকিয়ে ধমকালো, 'হেসো না আর। প্রত্যেকটা ব্যাপারে তোমার দাদা এরকম। বউকে কিচ্ছুটি জানাবে না। কি করছে, কি ভাবছে। সব বাইরের লোককে শুনিয়ে বেড়াচ্ছেন। কেনরে বাবা, বউ কি লোকের শত্রু!' রিমার গলা অন্যরকম শোনালো।

কিন্তু পরেশের মনে হ'ল, রিমা বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। ও প্রায় চিৎকার করলো, 'থামো তো। ফালতু ভ্যাচ্‌র-ভ্যাচ্‌র করবে না।'

'চুপ করো। অসভ্যের মত চেঁচিও না।' রিমা এবার চোখে আঁচল দিলে। সুরেশ, ঢোঁক গিলে, বললো, 'আচ্ছা, আচ্ছা ঠিক আছে। বৌদি শুনুন রাগ করবেন না।'

'থাক্‌। তোমার দাদা-তুমি দু'ঃ সবই এরকম।' সুরেশ কথাটা শুনে কেমন যেন অপ্রস্তুত হ'ল। গুটিয়ে গেল। নীতার দিকে তাকালো। নীতা আস্তে আস্তে বললো, 'দিদিভাই সুর রেগে গেছে। তাই না? অ্যাই দিদিভাই এসো তো মিষ্টিগুলো পড়ে রয়েছে। দ্যাখ আমি একা তোমাদের সকলকে সাজিয়ে দিতে পারবো না বাবা। তোমাকে হেল্‌প করতে হবে।' প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সুরেশ বললে, 'দুপুরে যে মাংসের স্টু করেছ ওটা বৌদি'কে টেস্ট করাও।' নীতা সঙ্গে-সঙ্গে বললো, 'নিশ্চয়। দাদা আপনি একটু টেস্ট করে দেখুন, উঁ?' বেতের চেয়ার থেকে কোন উত্তর এলো না। পরেশ বিরক্তিতে খবরের কাগজটা মলে ধরেছে। ওর দুমড়ে থাকা মুখের ভুরু আর চোয়ালের চারপাশে একটা ব্যথা জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। পরেশ তবু কাগজটা সরিয়ে, ভারী গলায় বললো, 'না, এমনি একটু চা দে।'

নীতা সুরেশের দিকে তাকালো। ওরা প্রত্যেকেই এক-একটা কাঁচের বাক্সে বন্দী হয়ে পড়ছিলো।

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

অরূপেশ জানা

এক সময় উর্দ্দু সাহিত্য আমার মনে প্রবল ভাবে রেখাপাত করেছিল। তখন উর্দ্দু কবিতা বা শায়েরী, যেখানে যেটা পড়েছি বা শুনেছি, লিখে রেখেছি খাতায়। সেই সব কবিতার মধ্যে ওমর খৈয়ামের রুবাই আমাকে সব থেকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল। যখন সময় পেয়েছি ওমরের কবিতা বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি তবে উর্দ্দু ভাষা আমি জানিনা। এ ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য নিতে হয়েছে ফিটজিরাল্ডের (Rubbayath-E-Omar Khayam) বইটির। অনুবাদ কর্মে আক্ষরিকতার চেয়ে কল্পনার প্রশ্রয় বেশী মাত্রায় আছে, এ জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

১.

প্রশ্ন যদি হঠাৎ অসে—
গোলাপকে আজ কেন্দ্র করে,
সেই তুলনায় রঙটা গাঢ়
কবর খানার লাল পাথরে।
উপর থেকে বৃষ্টি ঝরায়,
গুচ্ছ গুচ্ছ শ্বেত করবী
কবির প্রিয়ার জানুর পরে—
দক্ষিণ হাওয়ায় ঝরুক সব'ই

২.

চন্দ্রিমা আজ আলোর স্রোতে,
ভরায় সারা ভুবন খানি।
কোন অজানা নদীর কূলে,
শ্যাম ঘাসেরে শয্যা মানি।
এলিয়ে পড়ুক তোমার হৃদয়—
আমার সাথে আজ এখানে,
আদিম পাঠে নিমগ্ন হোক—
সত্য সেটাই সবাই জানে।

গেরিলা যুদ্ধ—মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার

দীপক দে

বর্তমান বিশ্বের পুঁজিবাদী শোষণ রোধ করার জন্য এবং ধনতান্ত্রিক সংকট-এর হাত থেকে বাঁচার জন্য সময়-অসময় গেরিলা যুদ্ধের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শান্তিপূর্ণ উপায়ে কায়েমী পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার দূরীকরণ সবসময় সম্ভব হয় না। এই কারণে, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার অপসারণ ঘটিয়ে, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা প্রচলন করার ক্ষেত্রে 'গেরিলাযুদ্ধ' অন্যতম সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

কিন্তু গেরিলা যুদ্ধ বলতে কি বোঝায়? গেরিলা যুদ্ধ হ'ল প্রতিক্রিয়াশীল গোপন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের তথা শোষিতের আপোসহীন সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই গেরিলাযুদ্ধের ভিত্তি হ'ল, সমর্থক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক একতা। বিশ্বের অন্যতম প্রধান গেরিলা যোদ্ধা চেগুয়েভার মতে গেরিলা হ'ল জনগণের মুক্তিযুদ্ধের জন্য নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা এবং প্রতিটি গেরিলা হবে অত্যন্ত শৃঙ্খলা পরায়ণ ও নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমিক। স্বভাবতই গেরিলা যুদ্ধের কৌশল সাধারণ সৈনিকদের থেকে আলাদা। এই প্রসঙ্গে চীনের অবিস্মরণীয় নেতা মাও-সে-তুং-এর অবদান উল্লেখযোগ্য। চীনের গণফৌজ সেখানের বুর্জোয়া শক্তিকে যে চরম আঘাত হানতে পেরেছিলো তা মাও এরই অনুপ্রেরণায়। মাও-এর মতানুসারে বলা যায় যে গেরিলা ও জনগণ-এর সম্পর্ক হচ্ছে ঠিক জলের সঙ্গে মাছের সম্পর্কের মত নিবিড়। গেরিলাযুদ্ধ সম্পর্কে মাও চারটি উল্লেখ করেছেন। (১) আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার জন্য পিছু হটো। (২) অপ্রস্তুত এবং নিরস্ত্র শত্রুকে আক্রমণ কর (৩) শত্রু যখন তৎপর তখন তাকে গেরিলা কায়দায় আক্রমণ কর এবং (৪) শত্রু যদি পালায় তবে তাকে তাড়া কর অর্থাৎ মারো অথবা মরো-চুক্তি, সন্ধি বা হারজিৎ-এর কোন অস্তিত্ব নেই।

বর্তমান কালে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল গেরিলা যুদ্ধ। চীনের মাও-সে-তুং এবং আর্জেন্টিনার চে গুয়েভারা গেরিলাযুদ্ধের দুই দিক্‌পাল একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এঁদের মধ্যে মতের অমিলের চেয়ে মতনৈক্য বেশি।

চে গুয়েভার তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক বিপ্লব প্রাঙ্গণে; ফোকিস্‌মো তত্ত্ব নামে পরিচিত। লাতিন আমেরিকায় এই তত্ত্বের অর্থ হ'ল বিপ্লবী কিউবাণ যুদ্ধের তত্ত্ব। তাঁর মতে জীবদেহের এক-একটি কোষ ভাগ হয়ে হয়ে যেমন বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় তেমনি এক-একটি গেরিলা থেকে সৃষ্টি হয় একাধিক বা অসংখ্য গেরিলা। সশস্ত্র আন্দোলনের এই তত্ত্ব সমগ্র লাতিন আমেরিকার পক্ষে উপযোগী বলে মনে হয়।

অপরদিকে মাও-সে-তুং-এর মতে গেরিলা যুদ্ধের তত্ত্ব, জনযুদ্ধ নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মতে, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে, বিপ্লবী জনযুদ্ধের মাধ্যমেই বুর্জোয়া শক্তির অবসান সম্ভব। মাও-এর দৃষ্টিতে বিপ্লবীযুদ্ধ, গেরিলাযুদ্ধ, ও জনযুদ্ধ একই বিষয়ের বিভিন্ন নাম। জনযুদ্ধ প্রধানতঃ জনগণের বৈপ্লবিক সমর্থন এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপরেই নির্ভরশীল। জনযুদ্ধ সম্পর্কে লিন্ পিয়াও বলেন, 'তোমরা তোমাদের কায়দায় লড়ো আর আমরা লড়ি আমাদের কায়দায়……।' তিনি আরো বলেছেন, অন্যান্য সৈনিকদের মত তিনি অস্ত্রশস্ত্রের বদলে বিপ্লবী জনগণের ওপরই বেশি আস্থাশীল। আগুন যেমন ধিক্ ধিক্ করে ছড়িয়ে পড়ে, গেরিলাযুদ্ধ তেমনি জনগণের মধ্যে নিঃশব্দে প্রসারতা লাভ করে।

ক্যাস্ট্রোনাদের সমালোচকদের মতে ফোকিস্‌মো তত্ত্ব হ'ল একরকমের সন্ত্রাসবাদ যা জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে না। মুষ্টিমেয় গেরিলাদের সাহায্যে এই বিপ্লব ঘটে। সুতরাং অনেকের মতে চে গুয়েভার ফোকিস্‌মো তত্ত্বে রোমান্টিক বুর্জোয়া ঝোঁক রয়েছে। কিন্তু মাও-এর তত্ত্বের ভিত্তি হল জনগণ। তিনি সর্বহারা শ্রমিকের নেতৃত্বে, কৃষিবিপ্লবের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মাও বর্ণিত জনযুদ্ধ হ'ল গ্রামা বৈপ্লবিক সংগঠনের মাধ্যমে বুর্জোয়া শক্তিকে আঘাত হানা। এবং তা নিশ্চয় জনগণ কেন্দ্রিক দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধ। চীনের মুক্তি যুদ্ধ, জাপ বিরোধী যুদ্ধ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধে মাও-এর তত্ত্ব বাস্তবতা পেয়েছে। কিন্তু ফোকিস্‌মো তত্ত্ব অর্থে বোঝায় সাময়িক বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম। যদিও গুয়েভার বর্ণিত ফোকিস্‌মো তত্ত্ব কিউবায় বাস্তব রূপ লাভ করেছিলো তবুও অনেকের মতে এই তত্ত্বের পুনরাবৃত্তির কথা ভাবাও অবান্তর এবং প্রায় অসম্ভব। গুয়েভার বর্ণিত গেরিলা বাহিনী যে সর্বদা লেনিনবাদী ও মার্কসবাদী পদ্ধতি'তে, সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে এমন কোন কথা নেই।

উপসংহারে বলা যায় যে, গেরিলাযুদ্ধ পুঁজিবাদী শাসনতন্ত্র দূরীকরণের জন্য তথা মুক্তিকামী জনগণের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ একথা অনস্বীকার্য। তবে, বুর্জোয়া শোষণতন্ত্রের অবসানের জন্য এবং শোষিত ও দরিদ্র সাধারণের মুক্তির জন্য শুধুমাত্র গেরিলাযুদ্ধের ওপর নির্ভরশীল হলে চলে না। কারণ বিপ্লবের অন্যতম শক্তি হ'ল জনগণ এবং জনগণের সমর্থনের জন্য বুলেটের চেয়ে (বল প্রয়োগের থেকে) মানসিক বন্ধন টের বেশি প্রয়োজনীয়। অন্যথায় বিপ্লব স্বাভাবিক কারণেই অকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

With best Compliment from :

National Tobacco Company

(A Division of Duncans Agro Industries Ltd.)
Tobacco House
1 & 2, Old Court House Corner
Calcutta-700 001

Phone : 22-6825/3, 22-2467, 22-4504, 23-3201

এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও শুভানুধ্যায়ীগণ

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়
ডঃ উত্তম দাশ
বলরাম বসাক
শেখর বসু
রমানাথ রায়
সমরেশ বসু
শান্তা চক্রবর্তী
দীপক দে
সঞ্জয় সিংহ
হারুণ অর রসিদ
সুনীল জানা
পুষ্কর দাশগুপ্ত
পরেশ মণ্ডল
তপোব্রত ঘোষ
অতীন্দ্রিয় পাঠক
শ্রীলেখা মজুমদার
অসিত চট্টোপাধ্যায়
সুকেশ জানা
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
রমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
অমল চন্দ
রুমা চক্রবর্তী
অনির্বান রায়
দেবেশ রায়

August
Vol. 1. No. 1, 1984 Rupees Two

নতুন ধারার প্রতিশ্রুতিবান, শক্তিশালী
লেখকদের কলমে, সম্পূর্ণ
নতুন স্বাদের
গল্প/কবিতা/উপন্যাস-এর
নিয়মিত আয়োজন
একমাত্র—

অন্যরকম-এ

প্রচ্ছদ ঃ রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক ঃ অতনু মজুমদার
অরূপেশ জানা

এই সংকলনে যাঁরা লিখেছেন ঃ

শান্তা চক্রবর্তী, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অতনু সেনগুপ্ত, সৌমা দাশগুপ্ত, অতনু মজুমদার, অরূপেশ জানা, শান্তনু চট্টোপাধ্যায়, দীপক দে।

আগামী সংকলনটিও বিষয় বৈচিত্র্যে পরিপুষ্ট হচ্ছে।

সম্পাদক কর্তৃক ৩৯/এ, দিলখুসা স্ট্রীট, পার্ক সার্কাস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত এবং মহাদিগন্ত মুদ্রণী, বারুইপুর, ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।